তারিখ 27 JAN 2016
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ১

সংবাদ

জানা দরকার মাধ্যমিক শিক্ষাক্রমের কিছু বৈশিষ্ট্য

মো. আবুল বাশার

বিগত কয়েক মাস মাধ্যমিক শিক্ষকদের বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্সে বিশেষ করে ধারাবাহিক পেশাগত উন্নয়নের জন্য বিষয়ভিত্তিক শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ এবং প্রধান শিক্ষক ও সহকারী প্রধান শিক্ষকদের প্রশিক্ষণ কোর্সে সেশন পরিচালনা করতে গিয়ে এবং বিভিন্ন সময়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করার ফলে আমার উপলব্ধিতে এলো যে, বর্তমান সরকারের সময় এত চমৎকার ও যুগোপযোগী একটি শিক্ষাক্রম (শিক্ষাক্রম ২০১২) প্রণীত হলো কিন্তু এর বিশেষ বিশেষ দিকগুলো অনেকেই জানেন না বা জানলেও ধারণা স্পষ্ট নয়। যদিও নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রম নিয়ে চলছে ব্যাপক কার্যক্রম। আবার শিক্ষাক্রম বিষয়ক কিছু সেশন উল্লিখিত প্রশিক্ষণ প্রোগ্রামেও অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যা আমাদের আশা জাগায়। তারপরও অনেক শিক্ষকেরই অনুরোধ ছিল যে, আমি যেন এ বিষয়গুলো লিখি। তাদের ধারণা শিক্ষাক্রমের সঙ্গে সমাজের প্রত্যেকেই কোন না কোনভাবে জড়িত। কাজেই পত্রিকায় লিখলে অনেকের পক্ষে জানা সহজ হবে। আমি বললাম ইন্টারনেটে শিক্ষাক্রম দলিল, বিস্তারিতভাবে আছে এবং তাদের ওয়েব অ্যাড্রেসও দিলাম। তাদের বক্তব্য হচ্ছে, ওয়েবসাইটে যাওয়ার সুযোগ সবার থাকে না। যাই হোক ভাবলাম কিছুটা তুলে ধরি। এ প্রেক্ষিতেই আজকের লেখার অবতারণা। স্বল্প পরিসরে সব বৈশিষ্ট্য তুলে ধরা সম্ভব নয়, তাই বিশেষ বিশেষ দিক বা বৈশিষ্ট্যগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করলাম।

প্রকৃতপক্ষে শিক্ষাক্রমের বিস্তার বা পরিসর বা উপাদানের প্রসঙ্গ আসলেই অনেক কথা চলে আসে। তবে বলা যায় শিক্ষাক্রমের প্রধান ক্ষেত্র পাঁচটি। যেমন, শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তথা শিক্ষাদর্শন, বিষয় ও বিষয়বস্তুর তালিকা, শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল, শিখনসামগ্রী যথা পাঠ্যপুস্তক, শিক্ষক নির্দেশিকা ও শিক্ষা-উপকরণ এবং মূল্যায়ন পদ্ধতি ও কৌশল। ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর নতুন শিক্ষাক্রমে এই পাঁচটি ক্ষেত্রের প্রতিটির উন্নয়ন করা হয়েছে। এই ৫টি ক্ষেত্রের আলোকে নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রমের বিশেষ বিশেষ বৈশিষ্ট্যগুলো হচ্ছে-১. জাতীয় ও বৈশ্বিক পরিস্থিতি এবং সমকালীন জীবনের চাহিদা বিবেচনা করে শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও সাধারণ উদ্দেশ্য নির্ধারণ করা হয়েছে, ২. 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ২০১২' এর লক্ষ্য হচ্ছে ৬ষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের সার্বিক বিকাশের মাধ্যমে মানবিক, সামাজিক ও নৈতিক গুণসম্পন্ন জ্ঞানী, দক্ষ, যুক্তিবাদী, সৃজনশীল দেশপ্রেমিক জনসম্পদে পরিণত করা, ৩. শিক্ষাক্রম উল্লম্ব ও আনুভূমিকভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ করার জন্য প্রতিটি বিষয়ের উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার সাধারণ উদ্দেশ্যাবলীর কোনটি কী মাত্রায় কোন বিষয়ে অর্জিত হবে তা সুষ্ঠুভাবে বিচার বিবেচনা করে বিষয়ভিত্তিক উদ্দেশ্য বিন্যস্ত করা হয়েছে, ৪. ষষ্ঠ-দ্বাদশ শ্রেণীর শিক্ষার উদ্দেশ্য ও বিষয়ভিত্তিক শিখনফল ডিজাইনে বুদ্ধিবৃত্তীয়, মনোপেশীজ এবং আবেগীয়, শিখনের এই তিনটি ক্ষেত্রের মধ্যে সমন্বয় করা হয়েছে। এতে শিক্ষার্থীর চিন্তন, দৈহিক, মানসিক, এবং আধ্যাত্মিক বিকাশ ভারসাম্যপূর্ণ হবে, ৫. অধ্যায় থেকে কী কী জ্ঞান, দক্ষতা, মূল্যবোধ ও দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করবে তা বুদ্ধিবৃত্তিক, মনোপেশিজ ও আবেগীয় শিখনফল হিসেবে প্রতিটি অধ্যায়ের শুরুতে সংযোজন করা হয়েছে, ৬. ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক চেতনা বিকাশের মাধ্যমে দেশাত্মবোধ ও জাতীয় ঐক্য বিকাশের ওপর গুরুত্ব প্রদান করে সবগুলো বিষয়ের শিক্ষাক্রম ডিজাইন করা হয়েছে, ৭. মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধ বিকাশের ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে শিক্ষাক্রমে জ্ঞান, দক্ষতা, সৃজনশীল ক্ষমতা, মূল্যবোধ বিকাশের পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। কেননা মানবিক ও নৈতিকগুণসম্পন্ন একজন ব্যক্তি মানব কল্যাণ ও জাতীয় উন্নয়নে অপরিসীম অবদান রাখতে সক্ষম। শিক্ষাক্রমের অন্তর্ভুক্ত সব বিষয়ের মাধ্যমে বিশেষ করে 'ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা' বিষয়ের মাধ্যমে, শিক্ষার্থীর নৈতিক বিকাশের ব্যাপক সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে, ৮. সাধারণ শিক্ষা ও মাদ্রাসা শিক্ষাধারাসহ সব ধারার শিক্ষায় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত একমুখী ও অভিন্ন কোর বিষয়ের প্রবর্তন করা হয়েছে, ৯. শিক্ষা বছরের কর্মদিবসের সংখ্যা অনুযায়ী প্রতিটি বিষয়ের শিখনফল ও বিষয়বস্তু ডিজাইন করা হয়েছে। এতে বিষয়বস্তুর ভার এবং ক্লাস সংখ্যা প্রাসঙ্গিকভাবে সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হয়েছে। মানবিক, বিজ্ঞান ও ব্যবসায় শিক্ষা শাখার বিষয়গুলোর বিষয়বস্তুর মধ্যে ভারসাম্য রক্ষা করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ের পাঠদান বিষয়ের জন্য বরাদ্দকৃত বিষয়বস্তু ক্লাসেই শেষ হবে, ১০. মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি শিক্ষায় বিষয়বস্তু মুখস্থ করার পরিবর্তে শোনা, বলা, পড়া ও লেখা এ চারটি দক্ষতা শ্রেণীকক্ষে অনুশীলনের মাধ্যমে শেখার সুযোগ সৃষ্টি এবং অর্জিত দক্ষতা মূল্যায়নের পদ্ধতি প্রবর্তন করা হয়েছে, ১১. বিজ্ঞানমনস্ক, যুক্তিবাদী, কর্মমুখী ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, ১২. ষষ্ঠ থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত 'তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি' বিষয়টি বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সেই সঙ্গে সব বিষয়ের শিখন-শেখানো কার্যক্রমে অন্য কথায় শ্রেণী কার্যক্রমে প্রযুক্তি ব্যবহারের ওপর জোর দেয়া হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে শিক্ষার্থীদের প্রযুক্তির প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হবে এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির দক্ষতা অর্জন করে একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় সক্ষম হবে, ১৩. নবম-দশম শ্রেণীতে ক্যারিয়ার শিক্ষা বিষয়টি সংযোজন করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের পেশা ও ক্যারিয়ার নির্বাচনে সাহায্যে করবে, ১৪. ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে 'কর্ম ও জীবনমুখী শিক্ষা' প্রবর্তন করা হয়েছে। যার মাধ্যমে কায়িক শ্রম ও শ্রমিকের প্রতি শিক্ষার্থীর দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন হবে, ১৫. তাত্ত্বিক জ্ঞানের সঙ্গে এর ব্যবহারিক কার্যক্রমের সমন্বয় করা হয়েছে। যেসব বিষয়ে ব্যবহারিক কাজ আছে যেমন- বিজ্ঞান, পদার্থবিজ্ঞান, রসায়ন, জীববিজ্ঞান, কৃষিশিক্ষা, গার্হস্থ্যবিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও খেলাধুলা, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি, চারু ও কারুকলা, এসব বিষয়ের যেখানে ব্যবহারিক কাজের নির্দেশনা আছে সেখানে তাত্ত্বিক অংশের সঙ্গে ব্যবহারিক কাজ শেষ করতে হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থী তত্ত্ব ও ব্যবহারিকের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজে পাবে। এতে শিখন জীবন ঘনিষ্ঠ এবং দীর্ঘস্থায়ী হবে, ১৬. ধর্ম শিক্ষার মাধ্যমে নৈতিক শিক্ষার ওপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। তাই সবগুলো ধর্ম শিক্ষার বিষয়গুলোর নাম ধর্ম ও নৈতিক শিক্ষা রাখা হয়েছে, ১৭. বর্তমানে কিশোর-কিশোরীদের সমস্যা বিবেচনা করে ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণীর কয়েকটি বিষয় যেমন- গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য/শারীরিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যবিজ্ঞান ও খেলাধুলা এবং বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয় বিষয়গুলোতে জীবন দক্ষতা অর্জন উপযোগী বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে, ১৮. ব্যবসায় শিক্ষা শাখাকে সমৃদ্ধ করা হয়েছে। নবম-দশম শ্রেণীতে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং এবং একাদশ ও দ্বাদশ শ্রেণীতে ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং এবং বীমা বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ১৯. 'সামাজিক বিজ্ঞান' বিষয়কে পরিমার্জিত রূপে 'বাংলাদেশ ও বিশ্ব পরিচয়' নামে প্রবর্তন করা হয়েছে। যাতে বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, অর্থনীতি, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ইত্যাদির গুরুত্ব দিয়ে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে পর্যালোচনার সুযোগ রয়েছে, ২০. তাত্ত্বিকভাবে গাণিতিক সমস্যা সমাধানের যোগ্যতা অর্জনের সঙ্গে সঙ্গে গাণিতিক দক্ষতা প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দেয়া হয়েছে, ২১. বিজ্ঞান শিক্ষার প্রায়োগিক দিকের ওপর গুরুত্ব দিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রয়োগ ও বিজ্ঞানমনস্ক করার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে, ২২. বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তন এবং এর প্রভাব ও করণীয় সম্পর্কে যোগ্যতা অর্জনে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে, ২৩. 'সুস্থ দেহে সুন্দর মন' -এ নীতির ভিত্তিতে 'শারীরিক শিক্ষা ও স্বাস্থ্য' বাধ্যতামূলক বিষয় হিসেবে চালু করা হয়েছে। সুস্বাস্থ্য অর্জনের বিভিন্ন দিক- খাদ্য, পুষ্টি, প্রজনন স্বাস্থ্য, এইচআইভি ইত্যাদি তাত্ত্বিক দিকের সঙ্গে ব্যবহারিক দিক যেমন শরীরচর্চা, খেলাধুলা, ব্যায়াম, ব্রতচারী ও স্কাউটিং বিষয়ভুক্ত করা হয়েছে, ২৪. পরিবেশ ও জলবায়ুর ওপর গুরুত্ব প্রদান করে প্রচলিত ভূগোল বিষয়ের নাম পরিবর্তন করে 'ভূগোল ও পরিবেশ' করা হয়েছে এবং পরিবেশ ও জলবায়ুসংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তু সংযোজন করা হয়েছে, ২৫. শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তাকে বাস্তবে রূপদানের ওপর গুরুত্বারোপ করে চারু ও কারুকলা বিষয়কে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত বাধ্যতামূলক এবং নবম থেকে দ্বাদশ শ্রেণী পর্যন্ত ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে রাখা হয়েছে। এর ফলে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে নান্দনিক দিকের বিকাশ ঘটবে, ২৬. পরস্পরকে জানা ও বোঝার লক্ষ্যে বাংলাদেশে প্রমবারের মতো 'ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি' বিষয় ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে প্রবর্তন করা হয়েছে, ২৭. যুগের চাহিদানুসারে সব স্তরের প্রচলিত বিষয়াদির বিষয়বস্তু আধুনিকায়ন এবং একাদশ-দ্বাদশ শ্রেণীতে ঐচ্ছিক বিষয় হিসেবে নতুন বিষয়াদি সংযোজন করা হয়েছে, ২৮. শিক্ষাকে জীবন ও বাস্তবমুখী করার প্রয়াস এবং দেশীয় প্রেক্ষাপটে উন্নয়নক্ষম জনশক্তি সৃষ্টির ওপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, ২৯. পাবলিক পরীক্ষায় 'সৃজনশীল প্রশ্ন' প্রবর্তনের মাধ্যমে শিক্ষার্থী মূল্যায়নের ব্যবস্থা করা হয়েছে। সৃজনশীল ক্ষমতা মূল্যায়নের জন্য প্রয়োজন শিক্ষার্থীর সৃজনশীল চিন্তা দক্ষতা বিকাশের জন্য অনুশীলন। শিক্ষাক্রমে শিক্ষার্থীদের শ্রেণীকক্ষে চিন্তা-উদ্দীপক প্রশ্ন ও কাজ অনুশীলনের মাধ্যমে শিক্ষার্থীর সৃজনশীল ক্ষমতা বিকাশের সুযোগ রয়েছে। মুখস্থ করার পরিবর্তে বিষয়বস্তু অনুধাবন, প্রয়োগ, বিশ্লেষণ, সংশ্লেষণ ও মূল্যবিচার করার ক্ষমতা বৃদ্ধির সুযোগ রাখা হয়েছে। এ জন্য শ্রেণীকক্ষে এবং শ্রেণীকক্ষের বাইরে চিন্তা-উদ্দীপক ও অনুসন্ধানমূলক কাজ; একক ও দলগতভাবে কাজ করার বিষয় শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, ৩০. শিক্ষার্থীকেন্দ্রিক শিখন-শেখানো পদ্ধতি ও কৌশল ব্যবহারের সুপারিশ করা হয়েছে। গতানুগতিক মুখস্থ করার প্রবণতাকে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। 'কী শিখতে হবে' এর পরিবর্তে 'কিভাবে শিখতে হবে' এর প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। কার্যক্রমভিত্তিক শিখন-শেখানো কাজ পরিচালনার সুপারিশ করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীর সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির পরীক্ষা প্রস্তুতিতে সহায়তা করবে, ৩১. শিক্ষার মাধ্যমে সর্বপ্রকার বৈষম্য দূর করে সমতা বিধানের সুযোগ সৃষ্টি। লিঙ্গ, ধর্ম, বর্ণ, জাতি, পেশাগত ও অর্থনৈতিক বৈষম্য দূর করার লক্ষ্যে একীভূত শিক্ষায় গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে, ৩২. বিশ্বায়নের চাহিদা অনুসারে মানবসম্পদ সৃষ্টির প্রয়াস, ৩৩. প্রতি পিরিয়ডের ব্যপ্তি বৃদ্ধি, অধ্যায়ন ভিত্তিক পিরিয়ড নির্ধারণ, শিক্ষাবর্ষে কর্মদিবসের সংখ্যা বৃদ্ধি করা হয়েছে, ৩৪. জাতীয় দিবসগুলোতে স্কুল খোলা রেখে দিবস উদযাপনের ব্যবস্থা প্রবর্তণ করা হয়েছে, ৩৫. ধারাবাহিক মূল্যায়নের (গঠনকালীন মূল্যায়ন) মাধ্যমে শিখন দুর্বলতা চিহ্নিত করে নিরাময়মূলক সেবার মাধ্যমে শিখন নিশ্চিতকরণের ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, ৩৬. বিষয়ভিত্তিক বুদ্ধিবৃত্তীয় ও মনোপেশিজ ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়ন এবং আবেগীয় ক্ষেত্রের ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, ৩৭. ধারাবাহিক মূল্যায়নের অংশ হিসেবে শ্রেণীর কাজ, বাড়ির কাজ, অনুসন্ধানমূলক কাজ ও শ্রেণী পরীক্ষা পরিচালনার জন্য সুস্পষ্ট ও সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে, ৩৮. প্রচলিত ব্যবহারিক পরীক্ষার সংস্কার সাধনের মাধ্যমে অতিরিক্ত নম্বর প্রদানের সুযোগ বন্ধ করা হয়েছে, ৩৯. সামষ্টিক মূল্যায়ন/সাময়িক পরীক্ষা ও পাবলিক পরীক্ষা পদ্ধতির সংস্কার করা হয়েছে, ৪০. বিদ্যালয়ের সাময়িক পরীক্ষার সংখ্যা ৩টি হতে কমিয়ে ২টি করা হয়েছে। এতে বিদ্যালয় পাঠকার্যক্রম পরিচালনায় কর্মদিবস বেশি পাচ্ছে। উল্লিখিত বৈশিষ্ট্য ছাড়াও আরও বৈশিষ্ট্য নবপ্রবর্তিত শিক্ষাক্রমের রয়েছে।

তবে যুগের চাহিদাসম্পন্ন বৈশিষ্ট্যসংবলিত শিক্ষাক্রম উন্নয়নই শিক্ষার লক্ষ্যে অর্জনের জন্য যথেষ্ট নয়। প্রয়োজন শিক্ষাক্রমের যথাযথ বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ। আর এই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন নির্ভর করে যোগ্য শিক্ষক নিয়োগ, শিক্ষকদের চাকরিপূর্ব ও চাকরিকালীন যথাযথ প্রশিক্ষণ, বার্ষিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন, শিক্ষাক্রমের নির্দেশনা অনুযায়ী অর্থাৎ প্রতিটি পিরিয়ডের দৈর্ঘ্য, দৈনিক পিরিয়ড সংখ্যা, সাপ্তাহিক পিরিয়ডের সংখ্যা ইত্যাদি বিবেচনা করে দৈনিক কর্মসূচি প্রণয়ন ও তার যথাযথ বাস্তবায়ন, সুবিন্যস্ত শ্রেণীকক্ষ, পাঠাগার, গবেষণাগার, কম্পিউটার ল্যাব, মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম, শিক্ষাক্রমের চাহিদা অনুযায়ী শিখন-শেখানো সামগ্রী, একাডেমিক সুপারভিশন, মনিটরিং ও মেন্টারিং এর ওপর। তবে এ কাজগুলো সুচারুরূপে করার দায়িত্ব শিক্ষকদের। অর্থাৎ শিক্ষকগণই শিক্ষাক্রম বাস্তবায়নের কেন্দ্রীয় চরিত্র। কাজেই শিক্ষকদের যোগ্য করে তোলে শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন কাজে আন্তরিকতার উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন স্বচ্ছ নিয়োগ প্রক্রিয়া, কর্মরত শিক্ষকদের নিবিড় পৌনঃপুনিক প্রশিক্ষণ যা পরিচালিত হবে পেশাগত প্রশিক্ষকদের মাধ্যমে, শিক্ষকদের কাজের স্বীকৃতি দেয়া, সমাজে এই চেতনা জাগ্রত করা যে, বিদ্যালয় সময়ের বাইরেও শিক্ষকদের অনেক সময়ব্যাপী প্রস্তুতি ও মূল্যায়নমূলক কাজ করতে হয়, শিক্ষকের কাজ শুধু রুটিন ওয়ার্কেই সীমাবদ্ধ নয়, শিক্ষকের মর্যাদা অনেক ওপরে, শিক্ষকদের যৌক্তিক মতামতকে গুরুত্ব দেয়া, শিক্ষকদের আর্থিক ও সামাজিক মর্যাদা বৃদ্ধি করা, বিদ্যালয়ে একাডেমিক পরিবেশ সৃষ্টি করা, শুধু উর্ধ্বতন কর্মকর্তার গতানুগতিক পরিদর্শন ব্যবস্থার পরিবর্তে একাডেমিক সুপারভিশন, মনিটরিং ও মেন্টরিংয়ের ব্যবস্থা করা, যার জন্য প্রয়োজন পেশাগত দক্ষ একাডেমিক সুপারভাইসর। শিক্ষা ব্যবস্থার প্রাণকেন্দ্র হচ্ছে শিক্ষাক্রম। শিক্ষাক্রম বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে জড়িত বিভিন্ন ব্যক্তিরা যদি আন্তরিকতার সঙ্গে বাস্তবায়ন কাজে অংশগ্রহণ না করেন তবে ঈপ্সিত শিক্ষাক্রম, বাস্তবায়িত শিক্ষাক্রম ও অর্জিত শিক্ষাক্রমের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য সৃষ্টি হবে। যা এত চমৎকার একটি শিক্ষাক্রমকে পূর্ণ সফলতা থেকে বঞ্চিত করবে। যথাযথ বাস্তবায়নের মাধ্যমে প্রবর্তিত শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অর্জনের সঙ্গে শিক্ষাক্রমের বৈশিষ্ট্য উদ্ভাসিত হোক- এটাই আজকের দিনের প্রত্যাশা।

[লেখক : সহযোগী অধ্যাপক]
basharnsl@hotmail.com